দৈনিক ইত্তেফাক

ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ

শিক্ষা নিয়ে নিরীক্ষা

শিক্ষার্থীরা গিনিপিগ

ছাত্রছাত্রীদের জন্য দুঃখ হয়। ওরা অবশ্যই মেধাবী। কিন্তু আমরা দায়িত্ববানরা ওদের মেধাকে সঠিক পথে চালনা করতে দিলাম না। ভালো গ্রেড পাওয়ার দায় ও প্রলোভনে পাঠ্য বিষয়কে ছকবন্দি করে দিলাম। খুব ভালো ফলাফল হলো কিন্তু জানার জগতের অনেক দরোজা জানালা খোলার সুযোগই পেল না তারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন করার দর্শন থাকে এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায় পর্যন্ত সিলেবাস থেকে এবং চারপাশের জগৎ সম্পর্কে যেটুকু জেনে ওদের বেড়ে ওঠার কথা সে পুঁজিটুকু আছে কিনা তা যাচাই করা। কিন্তু এই দুর্ভাগাদের নিজের মেধা কর্ষণ করার সুযোগ ছিল কোথায়!

স্বাভাবিকতা হারিয়ে যখন অস্বাভাবিকতা বাসা বাঁধে তখন এতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া মানুষ স্বাভাবিকতা ফিরে এলে অস্বস্তি বোধ করে। একেই তখন অস্বাভাবিক ভাবতে থাকে। বেশ কয়েক বছর আগে সরকারি বিশেষ নীতি অদৃশ্য জায়গা থেকে কার্যকর হলো। স্কুলের পরিচিত মেধাবী ও সংবেদনশীল শিক্ষকরা হায় হায় করতে লাগলেন। জানালেন তাঁদের কাছে অলিখিত নির্দেশ এসেছে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের নীতি পাল্টে ফেলতে হবে। হাত খুলে নম্বর দিতে হবে। শুধু তাই নয়, ভুল হোক শুদ্ধ হোক খাতাতে কিছু লিখলেই নম্বর দিতে হবে। অনেক শিক্ষককে স্বস্তি পেতেও দেখেছি। নির্দিষ্ট সময়ে ফল প্রকাশের কৃতিত্ব দেখাতে হবে। বেঁধে দেয়া সময়সীমায় যথানিয়মে খাতা মূল্যায়ন কঠিন হয়ে পড়ে। এবার হাত ভরে নম্বর দেয়ার ক্ষমতা পাওয়ায় খুঁটে খুঁটে খাতা দেখার দায় কমে যায়। অতি দ্রুত উত্তরপত্র মূল্যায়ন হয়ে যেতে থাকে।

বেশ কয়েক বছর আগে এমন বাস্তবতায় একজন অভিভাবকের প্রতিক্রিয়া নিয়ে পত্রিকায় একটি কলাম লিখেছিলাম। অভিভাবক বিস্মিত হয়েছিলেন তাঁর মেয়েটি এসএসসিতে 'এ-মাইনাস' গ্রেড পাওয়ায়। তাঁর মেয়ে মোটেও মেধাবী নয় বলে বাবার বিশ্বাস। স্কুলে বিভিন্ন ক্লাসে ফেল করে টেনেটুনে এসএসসি পর্যায়ে এসেছিল। টেস্ট পরীক্ষার সূত্রে তাকে এসএসসি পরীক্ষায় পাঠাতে চাননি স্কুল কর্তৃপক্ষ। অনেক বলে-কয়ে সে ব্যবস্থা করেছিলেন বাবা। প্রার্থনা ছিল অন্তত পাস করুক। সে মেয়ে কিনা এ-মাইনাস পেয়ে গেছে। আনন্দের বদলে বাবা ভীষণ বিস্মিত হয়েছিলেন। এভাবে মেধা বিস্ফোরণের পথ করে দেয় রাজনীতি। আর সরকার পক্ষ বড় মুখ করে এসব সরকারের সাফল্য হিসেবে দেখাতে থাকে। আমরা যারা শিক্ষার সাথে জড়িয়ে আছি তারা প্রতিদিন আতঙ্কিত হচ্ছিলাম। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের প্রজন্মকে।

ধীরে ধীরে দেখলাম এদেশের মানুষ—শিক্ষক, অভিভাবক আর ছাত্রছাত্রী অভ্যস্ত হয়ে পড়লো। জ্ঞানার্জন যাই হোক গালভরা গ্রেডটাকেই পছন্দ করতে থাকলো। আগে সনাতন ধারায় পুরো শিক্ষা বোর্ডে হাতে গোনা কয়েকজন মেধা তালিকায় থাকতো। ওরা অতি মেধাবী হিসেবেই সম্মানিত হতো। পরের ধাপে 'স্টার' পাওয়া ছাত্রছাত্রী ছিল। খুব বিখ্যাত কলেজে দু'চারজন স্টার মার্কস পেতো। কোনো মাঝারি মানের স্কুল থেকে এক-দুজন কোনো বছর স্টার পেলে হইচই পড়ে যেতো। ফার্স্ট ডিভিশনও সব স্কুল থেকে সবসময় পেতো না। মোটামুটি সেকেন্ড ডিভিশনেরই ছড়াছড়ি। উপরের স্তরগুলোয় যারা ছিল ওদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। দ্বিতীয় বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জানার জগৎও খুব ছোট ছিল না। মেধার বিচারে এরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতো। মেধাবী ফলাফল করেই জীবনের পরবর্তী ধাপে পা বাড়াতো।

এই পর্বে এসে অনেক রূপান্তর হলো। বৈশ্বিক ধারণার সাথে মিলিয়ে গ্রেডিং পদ্ধতি এলো। শিক্ষাকে আধুনিক করার জন্য পণ্ডিতজন নানা গবেষণা শুরু করলেন। টেক্সট বই পড়ায় মনোযোগ কমে গেলো। অপটিক্যাল মার্ক রিকগনিশন (ওএমআর) পদ্ধতিতে ঘর পূরণ আর অবজেক্টিভের ভেতর ঢোকানো হলো। নিরীক্ষায় থাকা পণ্ডিতরা এই প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের অধিক জ্ঞানী হিসেবে তৈরি করার জন্য পাঠ্যবইয়ের চাপে পিষ্ট করতে লাগলেন। অচিরেই পড়াটা প্রীতিকর না হয়ে ভীতিকর হতে লাগলো। পরীক্ষাগুলো একটি ছকে বন্দি হয়ে গেলো। শিক্ষার্থীর পক্ষে এসব সামাল দেয়া কঠিন। এই সুযোগে ত্রাতা হিসেবে অসংখ্য কোচিং সেন্টার গড়ে উঠতে লাগলো। টেক্সট বইয়ের বদলে গাইড বই চলে এলো পড়ার টেবিলে। ভালো মাঝারি সকল মেধার ছাত্রছাত্রীর 'এ-প্লাস', তথাকথিত 'গোল্ডেন এ-প্লাস' আর নিদেনপক্ষে 'এ' পাওয়াটা অধিকারের পর্যায়ে চলে এলো। পরিবারগুলোর মর্যাদার বিষয় হয়ে গেলো। সন্তান কিছু জেনে বড় হচ্ছে কিনা তার খোঁজ রাখার প্রয়োজন বোধ না করে এবং সংসারে খাওয়া-পরার বাজেট কমিয়ে দিয়ে হলেও চার-পাঁচজন প্রাইভেট টিউটর আর কোচিং সেন্টারের পেছনে ঢালতে থাকেন অর্থ। শুধু সামাজিক মর্যাদাই বলবো কেন, ভালো কলেজে ভর্তিরও নিয়ামক হয়ে গেলো ফলাফল। ভালো ফলের বিস্ফোরণে লাখ লাখ ছেলে-মেয়ে সার্টিফিকেট হাতে ভালো কলেজগুলোয় ভিড় জমালে হিমশিম খাওয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবার কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য সকলের ভর্তিযুদ্ধে যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ বন্ধ করে দিলো। প্রাপ্ত গ্রেডের ভিত্তিতে ভর্তির নিয়ম চালু হলো। অনেক ভালো বেসরকারি কলেজ 'এ-প্লাস' ছাড়া বিশেষ করে বিজ্ঞান শাখায় আবেদন করার সুযোগই রাখলো না। ফলে যে করেই হোক ভালো গ্রেড জোগাড় করা প্রধান লক্ষ্য হয়ে গেলো। রমরমা হতে লাগলো কোচিং আর গাইড ব্যবসা। এই অবস্থা উৎসাহী করলো প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের। যারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে শেষ পর্যন্ত এক হাত দেখিয়ে নিজেদের দাপুটে অবস্থা বজায় রাখলো।

জ্ঞানচর্চার বদলে যন্ত্র বানিয়ে দেয়া এসব ওজনদার গ্রেড পাওয়া ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় এসে অনেকেই ধরাশায়ী হয়ে পড়ে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য দুঃখ হয়। ওরা অবশ্যই মেধাবী। কিন্তু আমরা দায়িত্ববানরা ওদের মেধাকে সঠিক পথে চালনা করতে দিলাম না। ভালো গ্রেড পাওয়ার দায় ও প্রলোভনে পাঠ্য বিষয়কে ছকবন্দি করে দিলাম। খুব ভালো ফলাফল হলো কিন্তু জানার জগতের অনেক দরোজা জানালা খোলার সুযোগই পেলো না তারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন করার দর্শন থাকে এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায় পর্যন্ত সিলেবাস থেকে এবং চারপাশের জগৎ সম্পর্কে যেটুকু জেনে ওদের বেড়ে ওঠার কথা সে পুঁজিটুকু আছে কিনা তা যাচাই করা। কিন্তু এই দুর্ভাগাদের নিজের মেধা কর্ষণ করার সুযোগ ছিল কোথায়! মা তার মেয়েটিকে নিয়ে ছুটছেন এক কোচিং থেকে আরেক কোচিংয়ে। ঘড়ি ধরে বাসায় আসছেন প্রাইভেট টিউটর। চোখ ঢুলু ঢুলু করলেও স্বস্তি নেই। গ্রেডের পেছনে ছুটতে গিয়ে শিক্ষার্থীর দুরন্ত কৈশোর কেড়ে নিয়ে তাকে রোবট বানিয়ে ফেলা হলো।

এমনভাবে বিপর্যস্ত করার পর এইচএসসি পরীক্ষার শেষে টনক নড়লো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। দেখলেন ল্যাবরেটরির পরীক্ষায় গিনিপিগ মারা গেছে। সুতরাং নতুন আদেশ হলো—যেমন নম্বর পাওয়া উচিত তেমনই দিতে হবে। একনম্বরও বেশি দেয়া যাবে না। আমাদের সবকিছুতেই বৈপ্লবিক ঝড় ওঠে। এখানেও উঠলো। সাধারণ যুক্তিতেই ১-২ নম্বরের জন্য একটি উচ্চতর গ্রেড বঞ্চিত হলে তা বিবেচনা করা হতো, যেহেতু গ্রেডের সাথে ভর্তিযুদ্ধে টিকে থাকা না থাকার সম্পর্ক রয়েছে। দেখা গেলো অনেক শিক্ষার্থী একটি বাদে সবগুলো বিষয়ে এ এবং এ-প্লাস পাওয়ার পরও একটি বিষয়ে ৭৯ নম্বর পেয়ে এ মাইনাস হয়ে গেলো। ছিটকে পড়লো পছন্দের স্কুলে ভর্তির কিউতে দাঁড়ানোর সুযোগ থেকে। কিন্তু সরকারি নতুন আদেশ শিরোধার্য করতে এই মূল্যবান ১ নম্বর পেলো না। তাই অনেক হতভাগা-হতভাগীদের বাড়িতে এখন শোকের মাতম।

এ পর্যন্ত নিরীক্ষার ধ্বংসযজ্ঞের পর আশাবাদী হয়েছিলাম এতসব শিক্ষা পাওয়ার পর বোধহয় এবার পথ খুঁজে পেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু আবার নতুন আতঙ্কের ভয় আমাদের ভীত করে তুলছে। 'সঠিক নম্বর' দেয়ার কারণে এবার পাসের হার আর এ এবং এ-প্লাসের ঝড় অনেকটা কমেছে। একে অনেক কাগজে কেন যে 'ফল বিপর্যয়' লিখেছে আমি জানি না। তাহলে অসুস্থ ফলাফলের জোয়ারটাকেই কি আমরা সঠিক বিবেচনা করছি? আমাদের আতঙ্ক অন্য জায়গায়। বলা হয়েছে কোন্ লেখায় কেমন নম্বর দিতে হবে এর একটি গাইডলাইন দেয়া হয়েছে পরীক্ষকদের। ভালো, কম ভালো আর মাঝারিমানের উত্তরপত্রের ফটোকপি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে পরীক্ষকদের কাছে। কোন্ ধরনের উত্তর হলে কেমন নম্বর দেয়া হবে তা বলে দেয়া হয়েছে। আমি শুনে আবারো আতঙ্কিত হলাম। এমন বেঁধে দেয়া নির্দেশে কি লাখ লাখ উত্তরপত্র মূল্যায়ন সম্ভব? আর কোনকালে শিক্ষক ফর্মূলা মেনে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেছেন? শিক্ষক তার অভিজ্ঞতা আর মেধা থেকেই নম্বর দেন। অন্য কোনো তাপ চাপ না থাকলে নম্বরের আহামরি হেরফের হয় না। যুগ যুগ ধরে তো তেমনই হয়ে আসছে। গণিত বা এমন অবধারিত উত্তরের ক্ষেত্রে ফর্মূলাটির প্রয়োগ হতে পারে কিন্তু কলা ও মানবিক বিভাগ, সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগ এবং বিজ্ঞানের থিওরি বিষয়গুলোতে ছক মানা হবে কেমন করে? কোনো-কোনো প্রশ্নের উত্তর তিনভাবে বিশ্লেষণ করে প্রত্যেকেই সফল হতে পারে। কিন্তু নমুনা উত্তরপত্রে তো থাকছে একটি বিশ্লেষণ। বাকিরা নম্বরের সুবিচার কেমন করে পাবে? তবুও আমি কৌতূহলবশত গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লাসহ কয়েকটি জায়গায় স্কুলের শিক্ষকদের সাথে কথা বলেছি। তাতে জানলাম অধিকাংশ শিক্ষক এসব মডেল উত্তরপত্রের কথা জানেন না। কেউ কেউ বললেন—হেড পরীক্ষকের কাছে এমন মডেল উত্তরপত্র এসেছে বটে তবে সকল পরীক্ষকের কাছে এই ধারণা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়নি। ফলে সঙ্গত কারণেই গত এসএসসির ফলাফল কতটা পরিচ্ছন্ন হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা গবেষকদের এতসব অভিনব পদ্ধতি নিয়ে ভাবতে হচ্ছে কেন! যুগ যুগ ধরে শিক্ষকদের উপর থাকা আস্থা কি ভেঙে পড়লো? আস্থাহীনতার কারণ নিশ্চয়ই আছে। আমাদের নষ্ট রাজনীতি নানাভাবেই তো আমাদের শিক্ষা কাঠামোর ওপর ছুরি চালাচ্ছে। এখন বেসরকারি স্কুল-কলেজে মেধা নয়—আত্মীয়, দলীয় বিবেচনায় আর অর্থ-বাণিজ্যে শিক্ষক নিয়োগের বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। সরকারি স্কুল-কলেজের নিয়োগেও নানা সিস্টেম বানানো হয়েছে। এসব কর্তাদের জানা আছে বলেই কি তারা শিক্ষকদের স্বাধীন মূল্যায়নের প্রতি আস্থা রাখতে পারছেন না? তাই মডেল উত্তরপত্র পাঠিয়ে বলতে হচ্ছে—এমন লিখলে এমন উত্তর দেবেন!

এসবের চেয়ে রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো সুশাসনের পথে হেঁটে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে শিক্ষা ব্যবস্থার সকল দিকে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা। দক্ষ-মেধাবী শিক্ষকের বিকল্প নেই। স্কুল-কলেজে পাঠক্রম সংস্কার করতে গিয়ে আমাদের শিশুদের মহাজ্ঞানী করার ফর্মূলা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বিদেশি মডেলে সৃজনশীল বানানোর বদলে ক্ষুদে শিক্ষার্থীর বইয়ের বোঝা কমিয়ে একটি ক্লাস নদীর ধারে বেড়ানো বা ফুটবল খেলার মাঠেও তো হতে পারে। স্কুলে ফিরে এক এক জনের জন্য এক এক প্রশ্ন হতে পারে। অভিজ্ঞতার আলোকে যার যার মতো করে উত্তর লিখবে শিক্ষার্থী। এভাবে কি সৃজনশীলতার কর্ষণ হতে পারে না?

যেসব শিক্ষক এমন হযবরল অবস্থা নিয়ে ভাবেন তাঁদের ধারণা শিক্ষা সংস্কার নিয়ে যাঁরা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে কাজ করছেন সেখানে দলীয় বিশেষজ্ঞ বা চওড়া গোছের নামি ব্যক্তিত্ব বড় না হয়ে মাধ্যমিক, নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা নিয়ে যাঁরা ভাবেন, কাজ করেন এবং শিক্ষাদানের সাথে সম্পৃক্ত মানুষদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো উচিত। বিদেশের ফর্মূলা নয়, আমার মাটি থেকে বেরিয়ে আসা লাগসই সংস্কার বৈশ্বিক ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।

● লেখক : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যাল[য়]
shahnawaz7b@gmai[l]